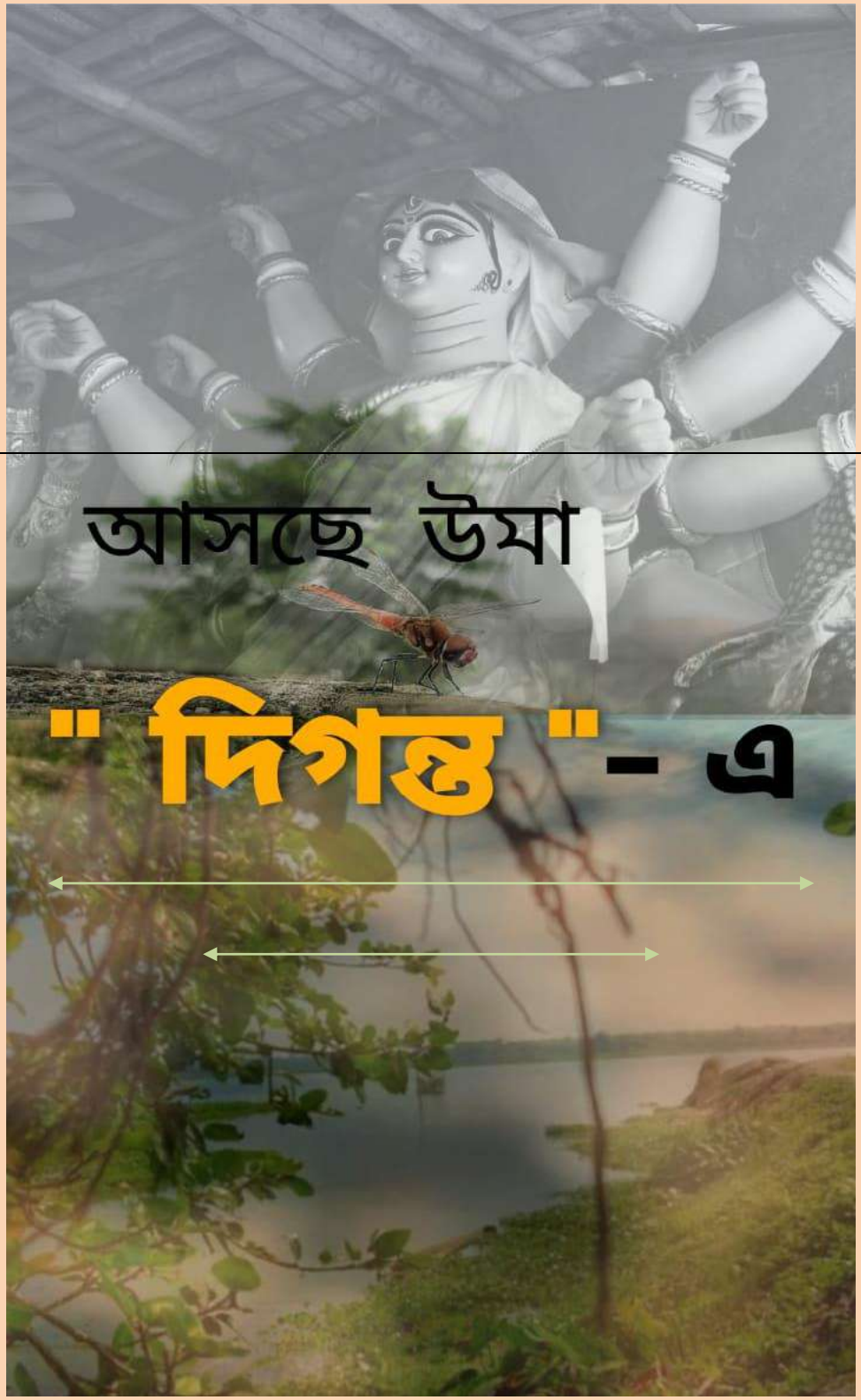
আসছে উষা
" দিগন্ত "- এ

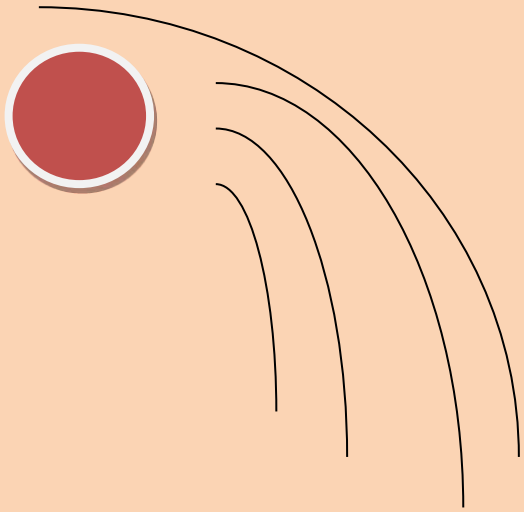

"Dificult Roads Often Leads To Beautiful Destinations"

সূচিপত্র

পূজো পার্বণ

1.কলকাতায় প্রাক পুজোর প্রস্তুতি ---------- 6-10

2. Dayanarupena Sangstita ---------- 11-12

3. ছবি মহল ---------- 14-18

4. ইন্দ্রিয়ানামধিষ্ঠাত্রী ---------- 19-21

5. খাদ্য মহল ---------- 23-26

তেরো পার্বণ

1. প্রাণ সঞ্চার ---------- 28

2. খালি হাত ---------- 29

3. দাগ ---------- 30-32

4. গল্প চিত্র ---------- 34-36

5. The Redio Man ---------- 37- 38

6. চিত্রায়ন ---------- 40-46

পূজো পার্বণ

কলকাতায় প্রাক্ পূজোর প্রস্তুতি

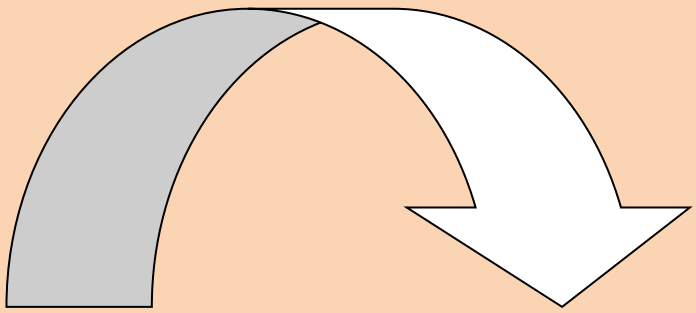

কলেজ স্কোয়ার সার্বজনীন দূর্গোৎসব ইতিহাস :

কলেজ স্কোয়ারের দূর্গাপূজা আজও বাঙালির কাছে সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালীর মতো নস্টালজিক। তবে এর শুরুটা অনেকেই জানেনা। সালটা ছিল ১৯৪৬,হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা চরমে। এরকম অবস্থায় পাড়ার বয়স্করা মিলে কমিটি গঠিত করেন এবং নির্নয় করা হয় সবাই মিলে দূর্গোৎসব উজ্জ্বাপন করা হবে। যাতে কচি কাঁচারা ধর্মর নামে দাঙ্গায় নয় ঐক্যতায় বিশ্বাস করে। শেষমেশ ১৯৪৮এ কলেজ স্কোয়ারের দূর্গাপূজা শুরু হয়। সেই সময় এই দূর্গোৎসব এর উদ্যোক্তা ছিলেন অজিত দে, অভয় চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন চৌধুরী, বালকনাথ ধর, পরেশ ভয়াল প্রভৃতি ব্যাক্তি। পরে অনেকেই এই দূর্গোৎসব সফল করতে এগিয়ে আসেন। ২০০০সালে 'রমেশ পাল'এর দূর্গা প্রতিমা, 'শ্রীধর ইলেকট্রিকস'এর আলোকসজ্জা কলেজ স্কোয়ারের পূজোকে বিখ্যাত করে তোলে। তারপর থেকে কলেজ স্কোয়ারের ট্রেডিশনাল আলোকসজ্জা, প্যান্ডেল, প্রতিমা একই ভাবে চলে আসছে।

তবে বিগত বছর থেকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে কর্তৃপক্ষকে। তাই এবার কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা কোনো রকম চাঁদা নেবেননা, একমাত্র বিশেষ মেম্বাররাই চাঁদা দিতে পারবেন।এবার দেবীমূর্তি, প্যান্ডেল, আলোকসজ্জা সবই হবে কিন্তু করোনার কথামাথায় রেখে উদ্যোক্তারা খোলা মন্ডপ বানানো পরিকল্পনা করেছেন। যাতে কলেজ স্কোয়ারের অন্যপ্রান্ত থেকে প্রতিমা দর্শন করা যায়।

(তথ্য সংগ্রহ - পিউ বোদক , ছবি - অপর্ণা ঘোষ , লেখা - শুভদীপ ভট্টাচর্য্য)

বাগবাজার সার্বজনীন দূর্গোৎসব ইতিহাস :

বাগবাজার সার্বজনীন দূর্গোৎসব বাঙালির শারদীয়ার ইতিহাসের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ। এই পুজোর ব্যাপকতা ও সৌন্দর্যতা বাঙালি সংস্কৃতিতে একটি আলাদা স্তান লাভ করেছে। এই পূজা কমিটির ইতিহাসকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম ভাগটির সময়কাল ১৯১৯ থেকে ১৯৩০ এবং ১৯৩০-এর মাঝামাঝি সময় ।১৯১৯ সালে বাগবাজারের "সরকার" বাড়িতে এই পূজা প্রথম চালু হয় এবং নামকরন করা হয় 'নেবুবাগান বারোয়ারি দূর্গাপূজা'; যা ৩ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। ১৯২৪ সালে কল্তপুকুরে এবং ১৯২৭ সালে বাগবাজারের কালী

মন্দিরে স্থানান্তরিত হয়। ১৯২৬ সালে নগেন্দ্রনাথ ঘোসালের মতোন ব্যাক্তিত্ব এই পূজা কমিটিতে যোগদান করেন,যিনি পূজা কমিটিতে যথেষ্ট অবদান রাখতে পেরেছিলেন। ১৯৩০ সালে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের পৌরপিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এ পূজা কমিটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, এবং নামকরণ করেন "বাগবাজার সার্বজনীন দূর্গোৎসব" । এই পূজা কমিটির প্রদশর্নীর জন্য তিনি বর্তমানের দুর্গানগরের "মেটাল ইয়ার্ড" স্থানটি নির্বাচন করেছিলেন, যেটিকে পূর্বে কলকাতা কর্পোরেশনের রোড রিপেয়ার ডিপাটমেন্টের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হত।দূর্গাচরণ এই স্তানটিকে পাওয়ার জন্য তৎকালীন কলকাতার মেয়র নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কাছে আবেদন জানান। নেতাজী আবেদন গ্রহণ করেন এবং পাঁচ হাজার টাকাও পূজা কমিটিকে প্রদান করেন।সেই পূর্বকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাগবাজার সর্বজনীন দূর্গোৎসব বাঙালির পূজা সংস্কৃতিতে এক অনন্য স্থান লাভ করে।

(তথ্য সংগ্রহ - স্বপ্না খাতুন , ছবি - শ্রুতি সিংহ রায় , লেখা - শুভদীপ ভট্টাচর্য্য)

সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার দূর্গোৎসব ইতিহাস :

বউবাজারের কাছে অবস্থিত একটি সরু গলি যার নাম সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার। এই সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার নামটি হয়েছে বাঙালির একজন স্বনামধন্য অভিনেতা সন্তোষ দত্তের নামানুসারে। এই সন্তোষ দত্তের অপর নাম হল সন্তোষ মিত্র। অভিনয়ের জগতে এসে ইনি নিজের নাম পরিবর্তন করেন।

এখানকার পূজার একটা আলাদা ঐতিহ্য আছে। এখানে প্রত্যেক বছরেই বিভিন্ন রকমের নতুন নতুন

পরিকল্পনা আমরা দেখতে পাই। যেমন কোনো সময় ইউরোপের কোনো একটি শহর আবার কোনো সময় পঞ্চাশ কেজি সোনার ঠাকুর ইত্যাদি। তবে এই বছর নতুন চমক, এই বছরের পুজোতে ফুটে উঠবে রাজস্থানের একটি চিত্র। এই বছর এখানকার পূজা ৮৬ তম বৎসরে পা রাখলো। গত বছরের করোনার ফলে যেমন নিয়মবিধি মেনে মানুষ ঠাকুর দেখেছে, এই বছরেও এখানে সেই নিয়মবিধি রাখা হবে ।

৮৬ তম বৎসরে এই সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে ফুটে উঠতে চলেছে রাজস্থানের বিখ্যাত, “পিঙ্ক সিটি” নামে পরিচিত জয়পুর শহরের একটুকরো প্রতিচ্ছবি। আসলে জয়পুরের লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির, যা আসলে বিড়লা মন্দির নামে পরিচিত। এই মন্দিরটির প্রতিচ্ছবি শোভা পাবে এই সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে।

(তথ্য সংগ্রহ - সপ্তর্ষি পাল , ছবি - সপ্তর্ষি পাল, লেখা - সৌরভ পুরকাইত)

কুমারটুলি পার্ক দূর্গোৎসব ইতিহাস :

শোভাবাজার অভয় মিত্র স্ট্রিট এর কাছেই অবস্থিত এই কুমারটুলি পার্ক। এখানকার পূজা প্রায় অনেক বছরের পুরনো। প্রত্যেক বছরই এখানে নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ ঘটে। এই বছরও তার অন্যথা হয়নি।

এই বছর এখানকার পরিকল্পনাটির নাম হল "কলরব নতুন প্রাণের"। নতুন প্রাণ অর্থাৎ নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি । অনেক নতুন প্রাণের একসাথে আগমন এবং তার সঞ্চার এখানে দেখা যাবে এখানে, সৃষ্টি হবে নতুন প্রাণের কলরব।

লকডাউনের ফলে আর্থিক সমস্যা দেখা গেলেও, এখানকার পূজা কমিটি অর্থের পরিমান অনুযায়ী খুব সুন্দর ভাবে আয়োজন করেছেন নিজেদের ঐতিহাসিক পূজাকে। বছরে একবারই হয় বাঙালি সবথেকে বড়ো ও গর্বের পূজা, তাই এই পূজাতে লোকজন যাতে ভালো ভাবে আনন্দ উপভোগ করতে পারেন তার জন্য নিজেদের সবটুকু দিয়ে কাজ চালিয়েছেন এখানকার পূজা কমিটির লোকজন।

এখানে তৈরি হচ্ছে খোলা-মেলা প্যান্ডেল। লোকজন এখানে ঠাকুর দেখতে এসে এই কোরোনা পরিস্থিতির মধ্যে যাতে কোনোরকম অসুবিধার সম্মুখীন না হয়, সেই জন্য সমস্ত নিয়মবিধি সঠিক ভাবে মানার ব্যাবস্থা করা হয়েছে।

(তথ্য সংগ্রহ - শ্রুতি সিংহ রায়, ছবি - শ্রুতি সিংহ রায় , লেখা - সৌরভ পুরকাইত)

মোহম্মদ আলি পার্ক দূর্গোৎসব ইতিহাস :

বিগত ৩ বছর মোহম্মদ আলি পার্ক এর পুজো অন্যান্য বছরের তুলনায় ছোট করে আয়োজন করতে হচ্ছে পুজো কমিটিকে। তার কারণ ব্রিটিশ আমলে টালা ট্যাঙ্ক এর জল ওই এলাকার মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। বর্তমান মোহম্মদ আলি পার্ক এর মাঠ এর নীচে জল সংরক্ষণ করার জন্য ট্যাংক বানানো হয়। কিন্তু সেই ট্যাংক জড়িত কিছু সমস্যা কলকাতা

পৌরসভা এর নজরে আসে। তারা পুজো কমিটিকে তাদের এই আয়োজনের স্থান পরিবর্তন করতে জানান কারণ সেখানে পুজোর আয়োজন করা হলে পুজো সংক্রান্ত নানান কাজের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ট্যাংকটি। সকল কতৃপক্ষের আলোচনা শেষে তারা তাদের আয়োজিত স্থানটি নিয়ে যান। সেন্ট্রাল রোড অবস্থিত দমকল স্থানে।

এবছর তারা কোভিড বিধি মেনে দর্শনার্থী দের তাদের পুজো প্যান্ডেল দেখার সহজেই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কলুটোলা রোড এর ওপর তাদের পূজোর আয়োজন করেছেন। এবছর তাদের ভাবনা করোনা প্রতিরোধক টীকা এর ওপর। এই ভাবনা মাধ্যমে তারা নাগরিককে দ্রুত টীকা নেওয়ার বার্তা দিতে চেয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে টীকা নেওয়া কোভিড সংক্রান্ত সকল বিধি নিষেধ মানলেই আমরা এই ভাইরাস এর হাত থেকে মুক্তি পাবো।

(তথ্য সংগ্রহ - অপর্ণা ঘোষ , ছবি - অপর্ণা ঘোষ , লেখা - অরিজিৎ সরকার)

Dayarupena Sangstita

- Saptarshi Paul

Picture collected by – Google

Bengal's biggest festival durga puja is knocking at the doors. Kolkata, the city of joy, is adorned with different lights and colours, in the joy of uma's arrival. During the four days, the Puja fever grips the heart of everyone in the city regardless of age, caste, class or gender. Everyone welcomes Goddess Durga and her children, along with the mighty demon Mahishasura, with open arms and hearts filled with incomprehensible emotions of togetherness. From the northern points of Tala and Bagbazar to the swanky southern pandals of Naktala and Behala, the Kolkata streets constantly witness waves of darshanarthis or 'pandal-hopping pilgrims' dressed in the best possible way they can.

There is a special relationship between the biggest red-light area of the country, the Sonagachi of Kolkata, and Durga Puja. The relationship is special in the sense that

the idol of Durga is made from the soil brought from the courtyard of sex workers. This mud is considered auspicious for conducting Durga Puja. But few years back these sex workers were not allowed to take part in this festival. Life has always been a struggle for them.

Picture collected by – Google

Maa Durga is the symbol of women empowerment, women power. She can't see the plight of hey child, of those sex workers who are also a women. After many years of struggle they started their Durga Puja in a small room in 2013.

The sex workers of Sonagachi were able to scale up their Durga Puja in 2017 by holding it in a full fledged marquee and idol following a Calcutta High Court order. Members of the Sonagachi Sarbojani Durgostav say their pandal may be small, but for the sex workers here, it symbolizes their power, love.

The one who created us without making any difference, then who are we to make the difference. So let's join hands and celebrate this puja together. Celebrations are always meant to be happy, and no one is supposed to be sad.

ছবি মহল

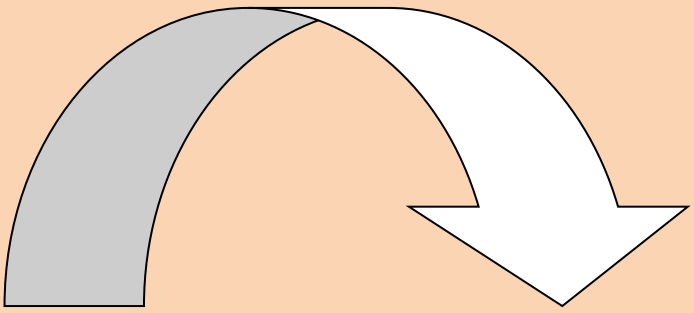

Art Cage

Captured by - Nikita Rekhi

The essence of Durga Puja starts from Kumartuli , the place where idols are made .

চিনির দানা

চিত্রগ্রাহক - শ্রেয়া রাউত

আমরা আবার ঠিক আগের মতন দুর্গাপূজোয় , প্যান্ডেলে ক্যাপ বন্দুক ফাটাবো ।

প্রতি বছরের দূর্গা মা

চিত্রগ্রাহক - শ্রেয়া রাউত , নিকিতা রেখি

প্রতিদিনের দূর্গা মা

আকাশ বাণী

(চিত্রগ্রাহক – অপর্ণা ঘোষ)

(চিত্রগ্রাহক – স্বপ্না খাতুন)

মেঘ চিঠি

(চিত্রগ্রাহক – পায়েল দাস)

(আঁকা - শ্রেয়া রাউত)

ইন্দ্রিয়ানামধিষ্ঠাত্রী

- সুপ্রিয় মিশ্র

নতেভ্যঃ সর্বদা ভক্ত্যা চাপর্ণে দুরিতাপহে ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ।।

" একটা গোটা বছর চলে গেল " - কথাটা মাছের বাজার থেকে চায়ের দোকান এর মন্ত্রীমহলে বলার জন্য বোধহয় নববর্ষ যথেষ্ট নয় । আমাদের মতো কিছু মানুষ যারা দূর্গাপুজা দিয়ে বছর গণনা করেন , নতুন জামা হোক বা ফ্রিজ ,টিভি হোক বা শাড়ি কিম্বা বউয়ের বায়না করে বসা সীতাহার - সবেতেই কেমন যেন বাঙালী বলে ওঠে , " এখন নয় পুজোর সময় কেনা যাবে " । কাজেই বাঙালী আকস্মিক "পুজো" শব্দটি শুনলেই দূর্গাপুজার কথাই আগে চিন্তা করে ।

এবার আসি অন্য কথায় , সারাবছর প্রত্যেক উইকেন্ডে পাঁচতারা , পাঁচ পাত্র পান করে , আর ডাস্টবিনে এঁটো ভর্তি করা উঠতি এলিট ভদ্রলোকটিও পুজোর আগে এসে জ্ঞান দিচ্ছেন - " প্রত্যেক বছর পুজোতে এতটাকার প্যান্ডেল করে কি হবে ? এই টাকায় কতো না খেতে পাওয়া মানুষ খাবার খেতে পারতো " - গত দশকে এই ধরনের মানুষদের সংখ্যা বেড়েছে অনেক । তবে লক্ষনীয় বিষয় হলো মহালয়ার দিন থেকেই কেমন যেন বাংলার মানুষ একটু বেশিই বাঙালী হয়ে ওঠে । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "ক্লাসিকিয়ানা " "সাবেকিয়ানে " এই দুই মোহে আসক্ত হয় বাঙালী দেবীপক্ষে । কেউ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলতে মাঠে নামেন , কেউ আবার হাতে ক্যামেরা তুলে ছুটল কুমুরটুলি । শহর ছাড়িয়ে মফস্বল , তাও ছাড়িয়ে গ্রাম - সবাই পিঠ টান টান করে বসল এবার । কথক ঠাকুর নামাবলীটি গায়ে দিয়ে গল্প বলবেন কেমন করে ঊমার শক্তিলাভ হলো । দুপুর বেলার টিভিতে ছোটোদের মহলয়া দেখতে দেখতে লুচি তরকারী খাওয়ার মজা এ শহরে আছে কিনা জানা নেই । অবশ্য সময় বদলে গেছে । তারপর টলি বলির পুজোয় মুক্তি পাওয়া ছবিগুলোকে প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে না দেখলে পুজোর কোটা সম্পন্ন হবে ? হবে না । তবু তো তাদের কাছে পুজোর কষ্ট আছে , ফিরে ফিরে আসে জাতিস্মরের স্মৃতির মতো । হয়তো শাড়ি আর পাঞ্জাবীটা একই থেকে যাবে , একটা বড়ো গ্যাসবেলুন হাতে নিয়ে দুজনের সুখের মুহূর্তগুলিও একই থেকে যাবে । বদলে যাবে মানুষদুটো । আফরিন সুনীলের হাত ধরে জীবনে প্রথমবার ঢুকবে পূজা মন্ডপে । ইসমাইল চাচা হয়তো এবার মা দূর্গার মুখের দিকে তাকিয়ে শবনম আর রাজেশের বিয়েটা মেনে নেবে , সাইকেল দোকানি ঘেটু হয়তো তার বউকে প্রথমবার তাঁতের শাড়ি কিনে দেবে , আর কেউ হয়তো মায়ের মুখের দিকে চেয়ে সব পাপ ভাসিয়ে দেবে চোখের জলে । আমার শহরে পুজো আসে একটা রেনেসাঁর মতো করে , জাগরিত করে সব্বাইকে । ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই ভুলে , বিমল আর বিষ্টু বউদের লুকিয়ে এক পেয়ালায় সুরাপান করে । রায় বাড়ির মেজবউ হয়তোবা চিরশত্রু চাটুজ্জে বাড়ির ছোটমেয়ের সাথে নবপত্রিকা স্নানে যায় । এরই মাঝে কোনো একদল তরুন-তরুনী পথশিশুদের জন্য ব্যাগভর্তি নতুন জামা নিয়ে বিলিয়ে বেড়ায় । পিটার জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ,সেন্ট পলস্ চার্চ থেকে ফেরার পথে সন্ধিপুজা দেখে থমকে গিয়ে , মা মা বকে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে , সেও তো বাঙালী । আমার বাংলায় বাঙালীরা নতুন জীবন পায় । নেতারা কদিনের জন্য দলাদলি আর কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি ভুলে পরিবারে আর সংসারে ফিরে যান ।

তবে শিল্পী চিরকাল কষ্টেই থাকে , ওটাই তার জীবন । তার জন্য বিজয়া দশমী সেদিনই সম্পন্ন হয় যেদিন বড়ো ট্রাক এসে তুলে নিয়ে যায় প্রতিমা , পোটো ঘরে ভাত ডাল এর জোগাড় হলেও , খালি হয়ে যায় তার আঙিনা আর খালি হয় তার বুকটা । মায়ের সরল অথচ গভীর দুটো মমতার চোখের দিকে তাকিয়ে কয়েকটাফোটা চোখের জলে বিদায় জানায় তার অপরূপ সৃষ্টিকার্যকে ।

অফিস , ইস্কুল , কলেজ সব ছুটি - একটা গোটা জাত হাল্লা রাজার মতো বলে ওঠে ছুটি ছুটি । বাঙাল-ঘটি , পদ্মা-গঙ্গা , মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল, হিন্দু-মুসলিম সব ভূলে কটা দিন বাঙালী শুধুই বাঙালী । বেশ্যালয়ের মাটি দিয়ে তৈরি মা দূর্গায় ওই প্রতিমা যেন মানুষ হতে শেখায় বাঙালীকে , প্রতিটা বছর । মা দূর্গা আসলে আছেন আমাদের সকলের মধ্যে , সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে , তিনি ইন্দ্রিয়ানামধিষ্ঠাত্রী ।

ইন্দ্রিয়ানামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাং চাখিলেষু ইয়া ।

ভূতেষু সততং তসৈ ব্যাপ্তে দেবৈ নমো নমঃ ।।

চিতিরূপেণ ইয়া কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগত ।

নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমো নমঃ ।

খাদ্য মহল

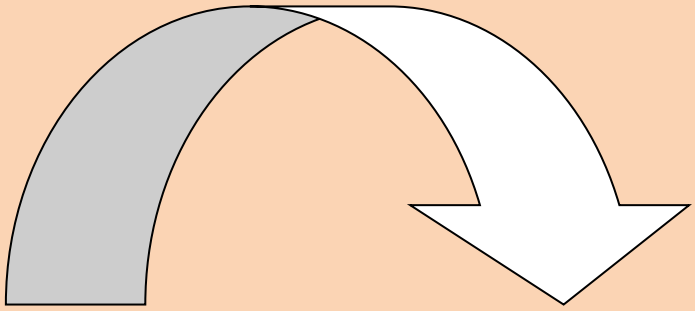

মা - র পাতে বনেদীয়ানা

- সহেলী সাহা

(আঁকা - প্রিয়া মন্ডল)

দুর্গাপুজো এই শব্দটা বাঙালির অত্যন্ত আবেগের। প্রত্যেক বাঙালি পুরো একটা বছর অপেক্ষা করে বছরের ওই পাঁচটা দিন ঘরের মেয়ে ঘরে ফেরার খুশি তে প্রাণ ভরে আনন্দ করার জন্য। সারা বছর ব্যাস্ত এই কলকাতা শহর ও সব ব্যস্ততা ভুলে মেতে ওঠে উৎসবের আনন্দে। আর দুর্গাপূজা নিয়ে বলতে গেলে বলতেই হয় এই হাল ফ্যাশনের যুগেও সেই ঐতিহ্য কে বহন করে চলেছে কলকাতার বুকে বসে থাকা শতক পুরনো বনেদি বাড়ি গুলি। তেতলা কার্নিশের সাত মহলা ঠাকুর দালান থেকে ভেসে আসা ঢাকের আওয়াজ আর মন্ত্র উচ্চারণ আজও বাঙালি কে আবেগের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তেমনই কলকাতার কিছু বনেদি বাড়ির বিশেষ ভোগ নিয়ে চলুন জানা যাক -

১। সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার:

আজ থেকে প্রায় ৪১১ বছর আগে ১৬১০ সালে গোবিন্দপুর, ডিহি কলিকাতা ও সুতানুটির জায়গীরদার লক্ষীকান্ত গাঙ্গুলি ও তার স্ত্রী ভগবতী দেবীর উদ্যোগে বেহালা, বড়িশার বাড়িতে দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। সাবর্ণ পরিবারের মোট আটটি দুর্গাপূজা হয়। সাবর্ণ পরিবারের তথা হিন্দু ধর্মের প্রথম কোন পরিবারে ত্রিধারার সঙ্গম হয়েছে অর্থাৎ বৈষ্ণব ,শৈব ও শাক্ত এই তিন মতেই দেবীর আরাধনা করা হয়। দুর্গা পুজোয় মাকে এই তিন ধারার নিয়ম মেনে ভোগ দেওয়া হয়। সাধারণত সাবর্ণ পরিবারে শাক্ত অর্থাৎ আমিষ ভোগ দেওয়া হয় দুর্গা মা কে। ব্যাতিক্রম, এই পরিবারের নিমতা পাঠানপুর বাড়ীতে নিরামিষ ভোগ দেওয়া হয় বৈষ্ণব মতে। আবার বিরাটি বাড়ির সান্ধ্য ভোগ অতি সাধারণ হলেও এটিই তাদের বিশেষ নিয়ম। ভোগে থাকে লুচি, আলুর চচ্চড়ি ও সুজির মোহনভোগ ইত্যাদি । ত্রিধারার সঙ্গম অর্থাৎ শাক্ত,শৈব ও বৈষ্ণব মতে পূজার নিয়ম শুরু করেন লক্ষীকান্ত গাঙ্গুলীর নাতি বিদ্যাধর রায়চৌধুরী।

২। শোভাবাজার রাজবাড়ি:

রাজা নবকৃষ্ণ দেব ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর শোভাবাজার রাজবাড়িতে দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। শোভাবাজার রাজবাড়িতে মা কে অন্ন ভোগ দেওয়া হয়না। এখানে মা কে বিভিন্ন রকমের মিষ্টি ও নোনতা ভোগ দেওয়ার নিয়ম। যেমন- জিভে গজা ,মতিচুর, চৌকো গজা, নিমকি এছাড়াও বিভিন্ন রকমের মিষ্টি ভোগ দেওয়া হয়। কিন্তু এই মিষ্টি ভোগের মধ্যেই এক বিশেষ ধরনের জিলিপি ভোগে দেওয়া হয় যা সাধারণ জিলিপি চেয়ে আকারে অনেকটা বড়। আর সিঙ্গারাও ভোগে দেওয়া হয়। যদিও তথাকথিত সিঙ্গারার মতো আলুর পুরের নয় এই সিঙ্গারার পুর হয় ছোলার ডালের। আর মাকে ষষ্ঠী আর দশমীতে বিদায়ের আগে কচুরি চেয়ে বড় আকারের ডালের পুরের রাধাবল্লভী ভোগ হিসেবে দেওয়া হয় আর এইসব কিছুই তৈরি হয় রাজবাড়ীর ভিয়েন ঘরে।

৩। জোড়াসাঁকো শিবকৃষ্ণ দাঁ বাড়ি:

১৮৪০ সালে গোকুলকৃষ্ণ দাঁ তার কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। কথিত আছে মর্ত্যে এসে মা প্রথম এই দাঁ বাড়িতেই অলঙ্কারে সেজে ওঠেন। হয়ত এর পর থেকে কলকাতায় এই প্রবাদের শুরু যে " মর্ত্যে এসে মা দাঁ বাড়িতে গয়না পড়েন, কুমোরটুলির অভয়চরণ মিত্রের বাড়ি মা ভোজন করেন আর শোভাবাজার রাজবাড়িতে মা রাত জেগে নাচ দেখেন "। এই দাঁ বাড়িতে মা কে গয়না পড়ানোর প্রচলন করেন গোকুলকৃষ্ণ দাঁ এর দত্তক পুত্র শিবকৃষ্ণ দাঁ। এই গয়না গুলি আসতো জার্মান, প্যারিস থেকে। এবার আসা যাক ভোগের কথায়, এই বাড়িতে প্রতিপদের দিন থেকে পুজো শুরু হয়। সেদিন থেকেই শুরু হয় ভোগ নিবেদন। দাঁ বাড়িতেও দেবী কে অন্ন ভোগ দেওয়া হয় না। মায়ের ভোগ হিসাবে দেওয়া হয় কাঁচা চাল, কাঁচা ও গোটা সবজি , গোটা ফল ইত্যাদি। এছাড়া মা কে লবণ বিহীন পাঁচ রকম ভাজা, লুচি ,ক্ষীর, দই ,মিষ্টি ইত্যাদি দেওয়া হয়। এবং সব রকমের মিষ্টি সহ এ বাড়ির বিশেষ নিয়ম খই ও বাড়িতেই বানানো হয়। এই খই দিয়ে চিনির পাকের মুড়কি ও মোয়া ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এছাড়াও বিশেষ ভোগে বাদামি চিনি দেওয়া হয়। আর অষ্টমীর সন্ধিপুজো তে কাঁচা চাল ও কাঁচা সব্জির অন্নকূট দেওয়া এ বাড়ির বিশেষ নিয়ম।সন্ধি পুজোর এই সব আয়োজন বাড়ির পুরুষেরাই করে থাকে ।

৪। চোরবাগান চট্টোপাধ্যায় বাড়ি:

উত্তর কলকাতার মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটে রামচন্দ্র ভবনে আজ থেকে প্রায় ১৬০ বছর আগে স্ত্রী দুর্গাদাসীর পরামর্শে পুজো শুরু করেন রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এখানে মা কে আমিষ ভোগ দেওয়া হয়। ভোগে দেওয়া হয় খিচুড়ি, ভাত, ভাজা ,মোচার ঘন্ট ,শুক্তো ,বিভিন্ন রকমের মাছের পদ ,চাটনি, পায়েস ,পাক্তুয়া ইত্যাদি। নবমীর ভোগে থাকে ইলিশ মাছের চাটনি ও ভেটকি মাছের ঘন্ট বিশেষ পদ হিসেবে। মায়ের দশমীর পান্তা ভোগের রান্না করে রাখা হয় নবমীর রাতেই। রান্নার তালিকা থাকে ভাত ,মসুর ডাল ,ছাঁচি কুমড়ো তরকারি, চালতার টক ইত্যাদি আর এইসব দিনের রান্না দায়িত্বে থাকেন ওই বাড়ির পুরুষেরা

৫। ছাতুবাবু ও লাটু বাবুর বাড়ির পুজো:

১৭৭০ সালে বাংলার প্রথম লাখপতি রামদুলাল দে (দেব সরকার) তার বাড়িতে দুর্গাপূজা শুরু করেন। পরে তা তার দুই ছেলের নামে অর্থাৎ ছাতুবাবু ও লাটু বাবুর পুজো নামে বিখ্যাত হয়। এই বাড়িতেও মায়ের পুজো শুরু হয় প্রতিপদের দিন থেকে। মায়ের পুজো করা হয় বৈষ্ণব মতে। প্রত্যেক দিনই মাকে নিরামিষ ভোগ দেওয়া হয় কিন্তু কোন প্রকার অন্ন ভোগ নিবেদন করার নিয়ম নেই রামদুলাল বাবুর বাড়ির পুজোয়। মা কে লুচি, ভাজা, তরকারি এবং নিরামিষ সাবেকি রান্নার বিভিন্ন পদ ভোগ হিসেবে দেন এই বাড়ির সদস্যরা। এখানে মা ও সাবেকি ও মায়ের ভোগ ও সাবেকি। প্রাত্যহিক দিন বাঙালিরা যেমন খাবার খায় তেমন সাধারন ভোগই মা কে নিবেদন করা হয় কিন্তু ভোগ সম্পূর্ণ নিরামিষ থাকে আর কোনো চালের পদ থাকে না। বাড়ির ছেলে,মেয়ে, বউরা মিলেমিশে মা দুর্গাকে আরাধনা করেন বৈষ্ণব কন্যারূপে।

তেরো পার্বণ

প্রান সঞ্চার

- তৃপ্তি দাস

(চিত্র গ্রাহক - অপর্ণা ঘোষ)

বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু বলেছেন, "গাছেরও প্রাণ আছে" সত্যিই তো গাছের প্রাণ আছে। যেভাবে একটি মানব ভ্রূণ রূপে মাতৃগর্ভে পালিত হয় এবং পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার পর যত্ন ও ভালোবাসার সহিত ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে ঠিক সেইভাবে একটি ছোট বীজ ভূমিগর্ভ থেকে পৃথিবীতে আসে একটি চারা গাছ হিসাবে যা যত্ন ও ভালোবাসার সহিত রূপ নেয় এক বৃহৎ বৃক্ষের। গাছ ও মানুষের মধ্যে রয়েছে যে শুধুই আকার ও আয়তনের পার্থক্য সমস্ত অনুভূতিই তো সমান । তাই তো বলি,

"নেই তো কোনো পার্থক্য! এই জগৎ ও ওই ফুলের বাগানের সমতুল্য। একটু যত্ন একটু ভালোবাসা এইটুকুই তো দাবি, এটাও কি অনেক? তবে কিসের এত অবহেলা ! সময় বড়ো কঠিন, দূরে সরিয়ে দিও না। সময় শিখিয়েছে একে অপরের খেয়াল রাখার, একসাথে পথ চলার ।

খালি হাত

- পিউ বোদক

ক্যারাটের মূল অর্থ হলো খালি হাত। এটি একটি জাপানি শব্দ, 1868 সালে সর্বপ্রথম 'ভীষন খুশি' ক্যারাটে-কে সারা পৃথিবীর কাছে নিয়ে আসেন, সেই সময় থেকেই ক্যারাটে একটি খেলা হিসেবে পরিগণিত হয়। কিন্তু ক্যারাটে মানে শুধুমাএ খেলা নয়, ক্যারাটে মানে সেল্ফ ডিফেন্স অর্থাৎ কোনরকম অস্ত্র ছাড়াই তোমার দুটি হাত কিভাবে তোমার আত্মরক্ষার বর্ম হবে তারই কৌশল। এই কৌশলে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ঘুষি, লাথি, হাঁটু ও কনুইয়ের ব্যবহার এবং ক্যারাটের মোট 75টি বিভাগ বা স্টাইল রয়েছে,স্টাইল গুলির মধ্যে অন্যতম হল Shotokan, Gojo-ryu, Uechi-ryu, shito-ryo..ইত্যাদি। এবং এই খেলার একটি মূল উপকরণ 'বেল্ট' এই বেল্টের বিভিন্ন ধরনের রং আমাদের খেলোয়াড়ের লেভেল চিনতে সাহায্য করে।

এবার প্রশ্ন থাকে যে, এতো খেলার মধ্যে আমি ক্যারাটেই কেন বেছে নেব! ..হ্যাঁ এর কারন আমি আগেই বলেছি, ক্যারাটে শুধুমাত্র খেলা নয় ক্যারাটে আপনার আত্মরক্ষার বর্ম (খালি হাত) এবং ক্যারাটে বর্তমানে ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল ছাড়িয়ে এখন অ্যালেম্পিক-এ যুক্ত, ফলে এই খেলার মাধ্যমে অবশ্যই ভবিষ্যত রয়েছে ।

এবং এক ক্ষুদ্র অরেঞ্জ বেল্ট প্লেয়ারের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এই খেলা বা কৌশল সবার জেনে রাখা উচিত, অন্তত পক্ষে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ।

দাগ

- সায়ন্তি বর্মন

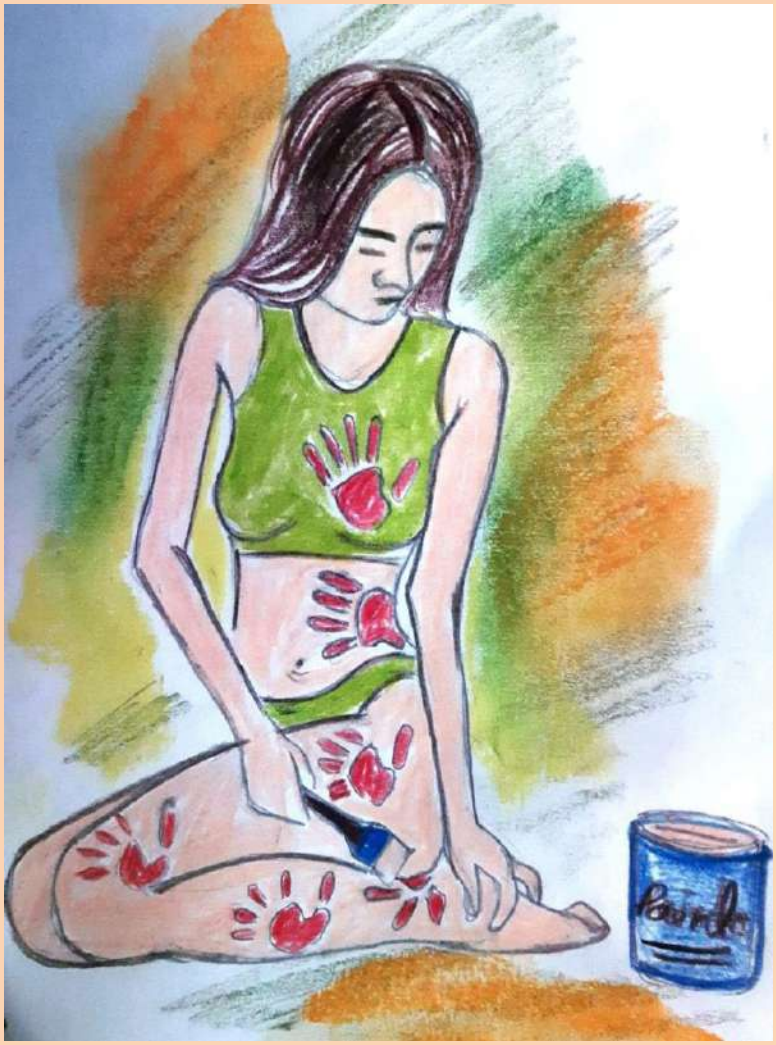

(আঁকা - শ্রেয়া রাউত)

আমি আজও কথা বলি

চলাফেরা করি আপন মনে।

তৈরি করেছি নিজের একটি ছোট্ট শহর

সেই শহরে একাই আমি বাস করি

কিন্তু পৃথিবী থেকে অনেক দূরে আমার এই শহর

আজ পৃথিবী থেকে অনেক দূরে আমি

কেন দূরে?

তবে চলো এক কাহিনী বলি -

আমি ছিলাম আমার বাবা-মায়ের ছোট্ট পরী,

আমায় পৃথিবীতে এনেছিলো সবচেয়ে সুন্দর মানুষ দুটি।

তাদের আদর-যত্নে এইতো সেদিন হাটতে শিখলাম

বাবা-মা ছিল বড়োই খুশি

তাদের ঘরে জন্মেছিল লক্ষী ।

কিন্তু ,

সেই দিন বিদ্যালয় যাওয়ার পথে

ঘনিয়ে এলো কালো মেঘ আমার মাথার উপরে।

নজর পড়লো আমার দূরে

দেখতে পেলাম আসছে কতগুলো হিংস্র কুকুর আমার দিকে তেড়ে।

জিভ থেকে ঝরে পড়ছে লোভীদের লালা

হঠাৎই ওরা এসে আমায় ফেলে ঘিরে

চিৎকার করার আগেই আমার মুখ দেয় বেঁধে,

তাদের মধ্যে দুজন দিল আমার হাত বেঁধে

আর বাকি দুজন বাধলেও আমার পাযুগল।

অতঃপর তারা আমায় নিয়ে গেল শুনশান এক এলাকায়

সেখানে আমাকে বাঁচানোর মত ছিলনা কোনো প্রাণী

তাই নিজেকে নিজেই চেষ্টা করলাম বাঁচানোর

কিন্তু আমার কাছে ছিলনা বাঁচবার কোনো পথ।

ওরা আমাকে ফেলে দিল এক জঙ্গলে

তারপর এক এক করে ছিঁড়ে খেলো আমার যোনিদ্বার।

অসহ্য যন্ত্রণায় আমার শরীর উঠেছিল জ্বলে-পুড়ে

কিন্তু পুরুষ জাতির কাছে তো নারী জাতি সর্বদাই বেজায় অসহায়!

তাদের মধ্যে কেউ করলো না আমায় ক্ষমা।

আমায় ছিঁড়ে খাওয়ার পরেও তৃপ্তি মেটেনি তাদের

এক লোহার রড পুঁতে দেয় আমার যোনিদ্বারে।

তারপর আমার সেই ক্ষত-বিক্ষত শরীর ছুঁড়ে ফেলে দেয় রাস্তায়।

কিছুদিন পর আমার মৃত্যুর প্রতিবাদে করা হয় অনেক মিছিল।

জালানো হয় অনেক মোমবাতি।

চাওয়া হয় সঠিক বিচার,

চাওয়া হয় সেই হিংস্র কুকুরগুলোর মৃত্যুদণ্ড।

কিন্তু একাধারে লাভ হয়নি কোনো।

হিংস্র কুকুরগুলো আজও ঘুরে বেড়ায় মাথা উঁচু করে

খোঁজ করে নতুন শিকারের।

যদি করা যায় আবার কারোর রেপ।

তবে কি সত্যি কোনদিনও এই সকল হিংস্র কুকুর জাতির এরূপ নোংরা কাজের জন্য মিলবে না কোনো শাস্তি?

সমাজ কি তাদের মেনে নেবে এই ভাবেই?

তবে কি আবারও হবে কোনো নারী এদের হাতের শিকার?

মিলবে না কি কোনো সঠিক বিচার ?

এ দাগ মুছবে কবে ?

গল্প চিত্র

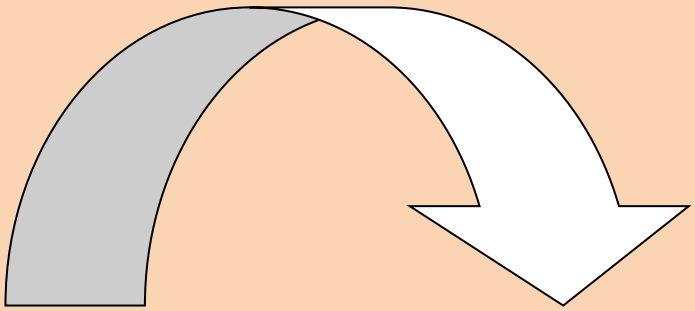

সংসার সুখের হয় রমণীর গুনে , গুন বান পতি যদি থাকে তার সনে :

- সায়ন্তি বর্মন এবং অপর্ণা ঘোষ

আমার স্বামী দিন মজুরের কাজ করত তবে আমাদের ইচ্ছা ছিল ছোট্ট একটা নিজেদের চা এর দোকান করার, অল্প অল্প টাকা জমিয়ে ও আর আমি মিলে অনেক কষ্টে এই ছোট্ট দোকানটা শুরু করি।

প্রথম দিকে দোকানে ওর সাথে সাহায্য করার মতন কাউকে রাখার ক্ষমতা ছিলনা আমাদের, তাই আমিই দোকানে ওর সাথে যেতাম, ওর হাতে হাতে কাজ এগিয়ে দিতাম।

ও কখনো আমার দোকানে যাওয়া নিয়ে আপত্তি করেনি, বরং আমায় সব সময় সাথে নিয়ে এগিয়েছে।আমার কথা শুনেছে পাশে থেকেছে। ওর ব্যবহার কখনো পুরুষত্ব সূচক ছিল না।

আমি দোকানে লুচি ভাজি, আর ও গরম গরম লুচি খরিদ্দার কে পরিবেশন করে।

শুধু আমার স্বামী নয় আমিও তার সাথে হাতে হাত লাগিয়ে কাজ করি।নিজেদের এই পরিশ্রম গুলো একসাথে করে আজকে এতটা দূরে এসেছি।আমার স্বামী সব সময় আমার পাশে থেকেছেন।দুজন মিলে মিশে কাজ করতে করতে কত দিন কেটে গেল । বেশ চলছে আমাদের দোকান এখন বাইরের কাউকে রাখার কথা ভাবি না দুজন মিলেই গড় গড়িয়ে চলছে দোকান।

এই করোনা পরিস্থিতিতে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে।কিন্তু তাও অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে আমরা আমদের এই ছোট দোকানটি ঠিক ভাবে গুছিয়ে রেখেছি।

ছবি - শ্রেয়া রাউত এবং নিকিতা রেখী

দোকান, বাড়ি, টাকা পয়সা সব আমিই সামলায়। ও বলে ছেলেদের থেকে নাকি মেয়েরা বেশি ভাল সংসার সামলাতে পারে। তাই ওর প্রয়োজন এর টাকা ও নিয়ে বাকি টাকা আমায় দিয়ে দেয়। দোকানেও খদ্দেরদের কাছ থেকে টাকা আমি কাটি ।

ব্যবসা হোক বা সাংসারিক জীবন,একজন মেয়ে ও ছেলে দুজন দুজনের পরিপূরক হলে তবেই সাফল্য পাওয়া যায়। স্বপ্ন টা দুজন একসাথে দেখেছিলাম আর পুরণ ও একসাথে করলাম। আমাকে ওই একজন সম্পূর্ণা করে তুলেছে। সব ছেলে খারাপ হয় না, তেমনি সব মেয়েও সাংসারিক হয়না। স্বয়ংসম্পূর্ণা হতে হলে দুজনকেই দুজনের পাশে শক্তভাবে হাত চেপে থাকে যেতে হয়।

কথায় আছে সংসার সুখের হয় রমণীর গুনে গুনো বান পতি যদি থাকে তার সনে ।তাই কেবলি নারী বলা ভুল আসলে তো নারী পুরুষ দুই হলো সৃষ্টির বীজ ।

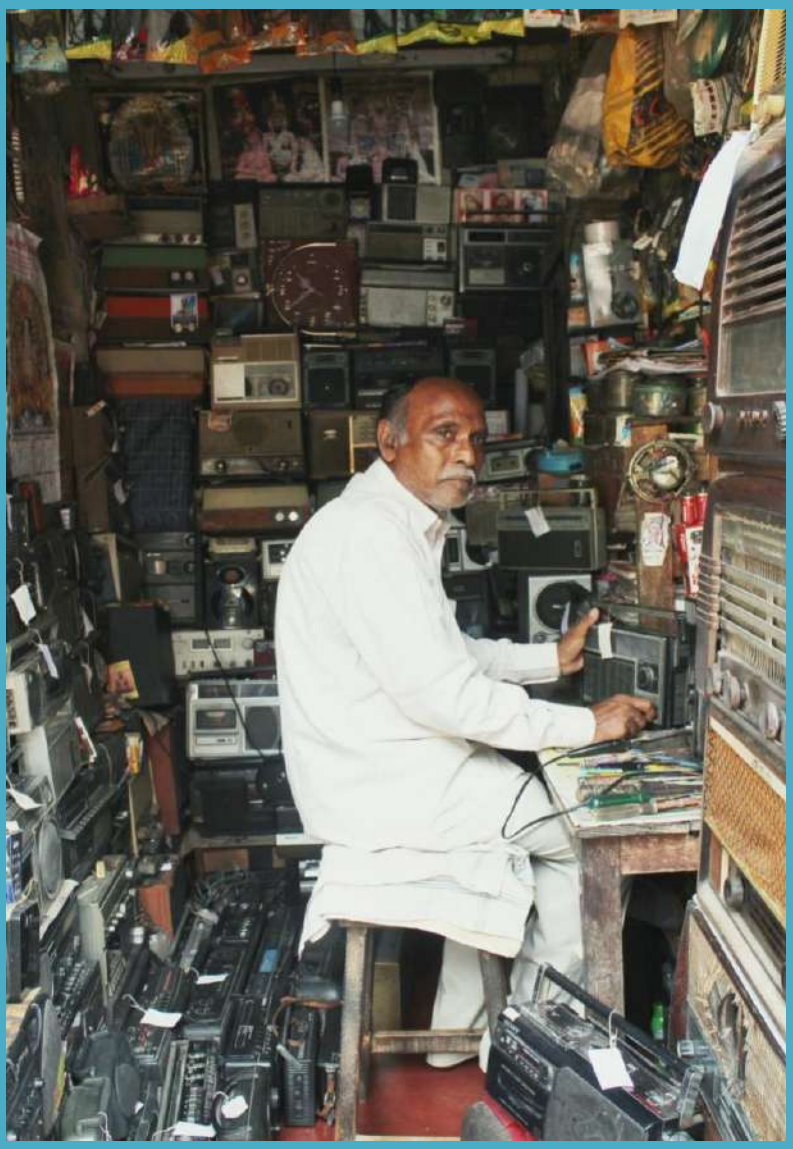

Captured by – Shreya Routh

THE RADIO MAN

-Nikita Rekhi

Hello reader's let's introduce to our famous Kolkata Radio Man his name is Amit Ranjan Karmakar age 64. During 90's his job was to repair the radio but nowadays he mostly rent his radio for movie shoot .His oldest radio is from 1945 which is before independence . Visitors and photographers usually come during Durga Puja bring their old radio along to be repaired by him .

RADIOS

Captured by - Nikita Rekhi & Shreya Routh

চিত্রায়ন

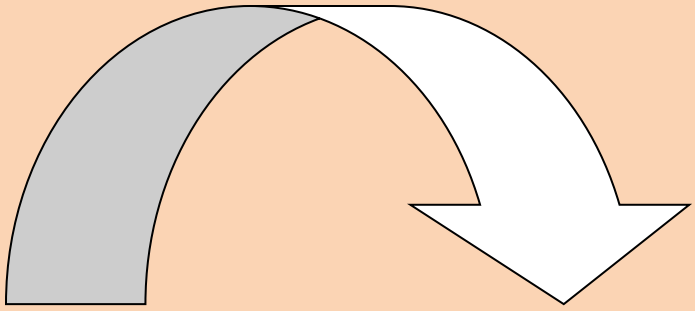

)

(Drawing – Monalisha Das)

90's look of North Kolkata

(Drawing - Priya Mondal)

The pure essence of love between Shiv and Kaali .

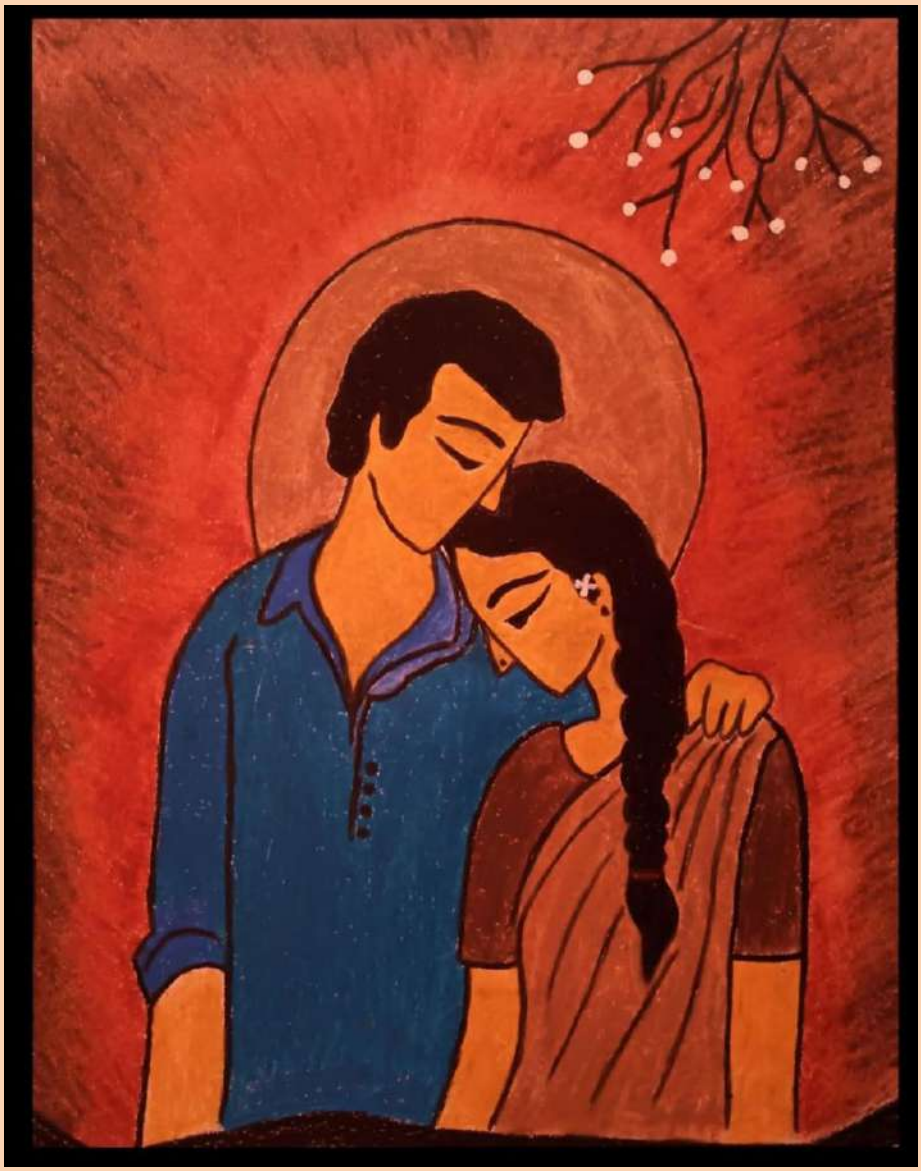

(আঁকা - শ্রুতি সিংহ রায়)

“ তখন তোমার একুশ বছর বোধ হয় ”

(আঁকা - শুভদীপ ভট্টাচার্য্য)

ওরে বাবা !!

জলটা কি ঠান্ডা

জল কি ঢালবো ??

দূর দূর স্নান না করলে তো মা ও ছাড়বে না আমায়।

(আঁকা – শ্রেয়া রাউত)

দেখো .....

আজ আকাশে কত তারা।

(আঁকা - আভাস নাগ)

তোমার ছেলে নেই তো কি হয়েছে আমি তো আছি।

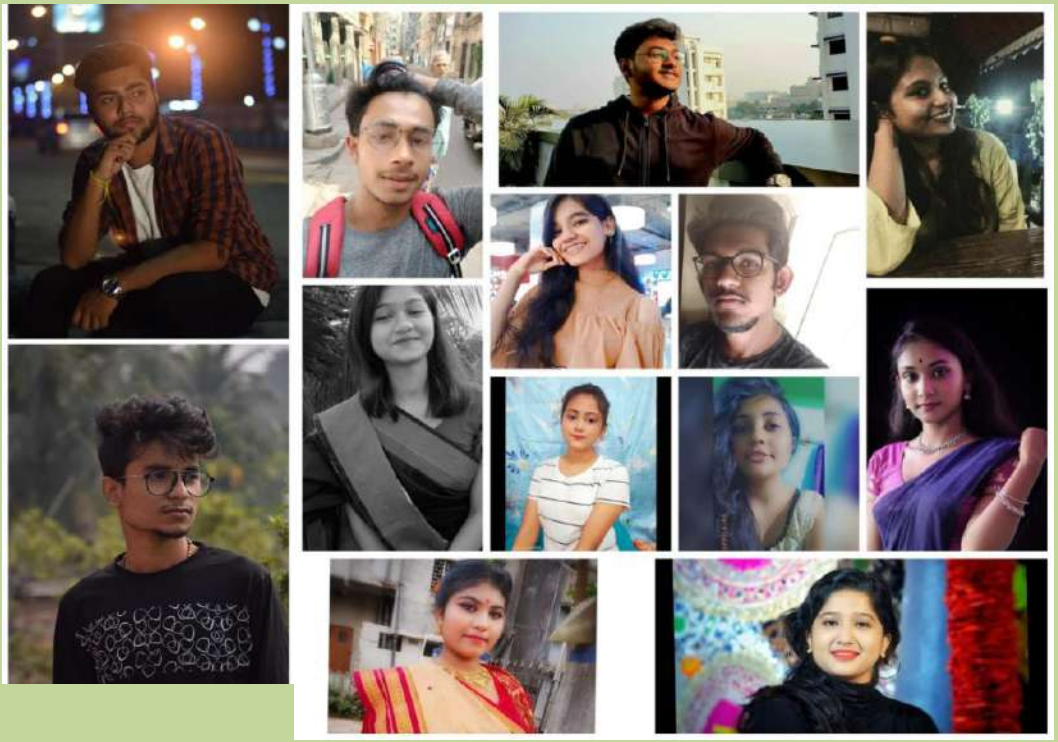

আমরা সবাই

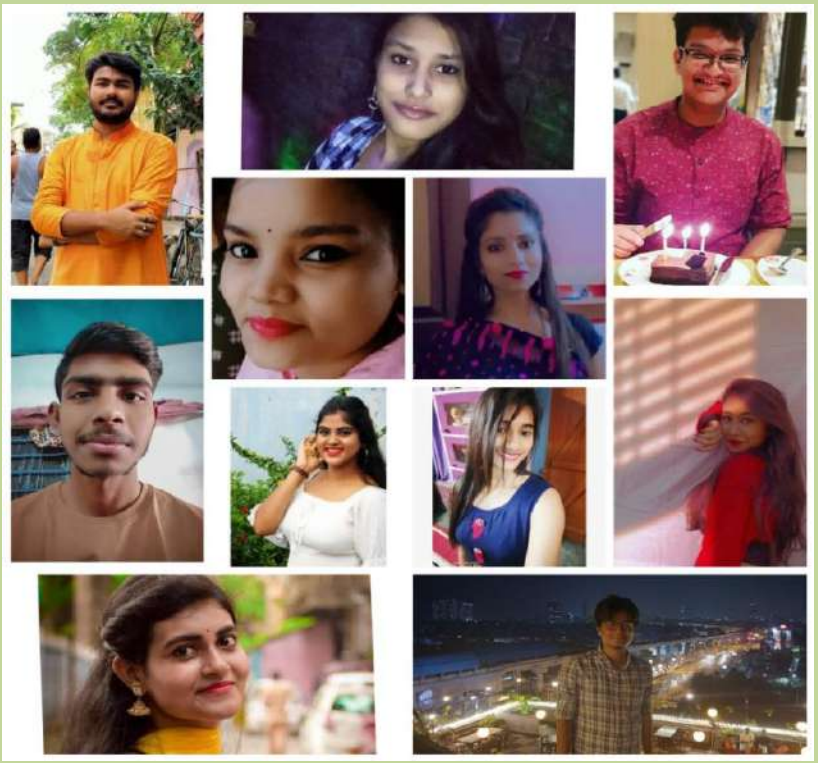

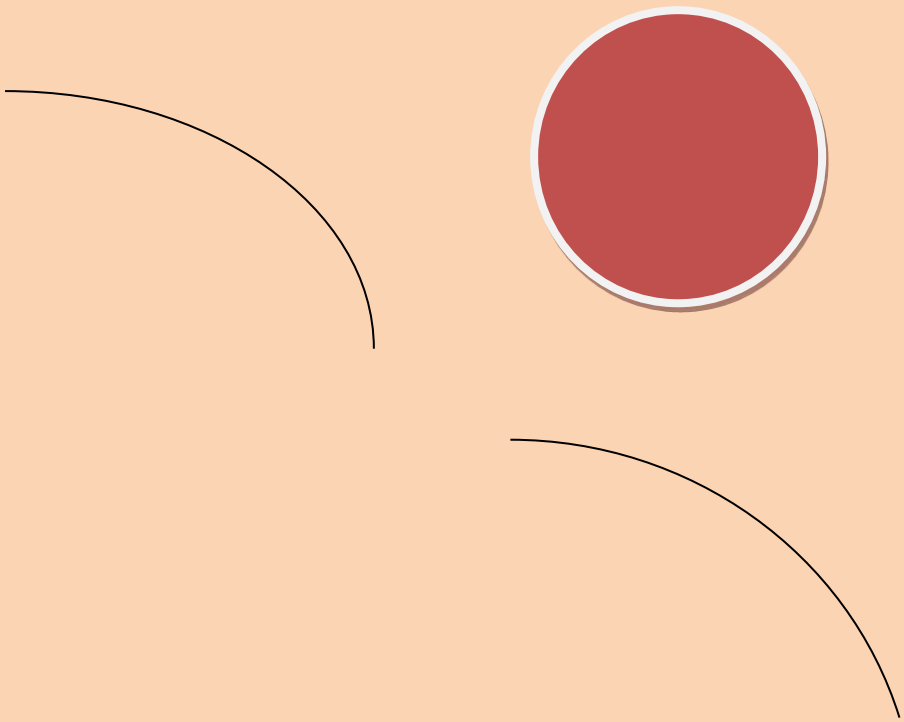

"আবার আসিব ফিরে"

_প্রতি বার প্রতি রূপে_